প্রতিধ্বনি the Echo
An Online Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

ভারতীয় সমাজ চেতনায় মনসা নাগিনী না নারী?

(Bharotiyo Somaj Chetonay Manasa Nagini Na Nari?)

Smt. Anita Goswami (Jash)
Asst. prof., Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam

Abstract

In Indian philosophy woman is perceived as a benevolent force, an all-embracing, all enduring presence like the earth herself and is called the other name of sacrifice.Woman who choose to be different from this and is rebellious by nature is consieded in the eyes of society, an outcast, a disgrace to her kind.

Manasa in 'Manasamangal Kabya' is one such exception. Hence in the eyes of society, she is cruel, conniving, a venomous being, completely inhuman. But if we go beyond the surface and delve deep into her world, she emerges as the eternal woman before our eyes as we come to meet in her a daughter, a wife, a mother ever so gracious. For she is not venomous by birth, she has been made so by her surroundings and near and dear ones. Life-long strife, torture and exploitation have made her vengeful and vicious. No one gave her space. She had to fight for every inch of the ground beneath her feet.

Had she not been cheated by life, she would have been gracious and kind like many others; she would have been a source of life

ভারতীয় জীবনধারায় নারী সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আমাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, নারী হবে সমাজ, পরিবার বা ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে মঙ্গলময়ী কল্যাণী, সে হবে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। নারী সম্বন্ধে এই ধারণাটি আমরা প্রায় বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে আসতে দেখেছি। সেক্ষেত্রে নারীর প্রতি যত অন্যায়, অবিচারই হোক না কেন সে কোন প্রতিবাদ করবে না, নতমস্তকে মেনে নেবে সবকিছু। এই ছিল আমাদের সমাজের ভাবনা। কিন্তু কোন নারী যদি বিন্দুমাত্র এর ব্যতিক্রমী হয় অর্থাৎ নারী সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ভাবনাকে আঘাত করে থাকে তাহলে তাকে আমরা 'নারী জাতির কলঙ্ক' এই তক্‌মাটি পরিয়ে দিই। কিন্তু যে মেয়ের জন্মলগ্নই অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বাকি জীবনও যাকে বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়, সেই নারীকে নিষ্ঠুরা, ভয়ঙ্করী প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত? আমরা যদি কন্যা, বধূ এবং মাতারূপে তার জীবনের বিভিন্ন পর্বগুলি সহমর্মিতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে তার সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা পাল্টে যেতেও পারে।

দুর্ভাগ্য-পীড়িত নারী চরিত্রের শোভাযাত্রা রয়েছে 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে। এই কাব্যের প্রথম নারী চরিত্র গঙ্গা দুর্ভাগা। দুর্ভাগা বেহুলা, সনকা। এমন কি এই কাব্যের নাম ভূমিকায় যিনি সেই মনসাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা। দেবতাদের জন্যে রান্না করতে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরতে না পারায় গঙ্গার স্বামী শান্তনু তাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করেন। নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করার সময় শান্তনু একবারও ভেবে দেখলেন না

সে কোথায় যাবে। বিবাহের পূর্বেই অকারণে বেহুলার উপর মনসার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। বিয়ের রাতেই বাসর ঘরে সাপের কামড়ে তার স্বামী লখীন্দরের মৃত্যু ঘটেছে। কলার ভেলায় স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেসে গিয়েছে সে অনির্দিষ্টের পথে। মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে তার জীবন। সনকা কোন পাপ না করেই তার সাত পুত্রকে হারিয়েছে। পুত্রহারা জননীর চোখের জলের সঙ্গে মিশেছে বিধবা পুত্রবধূদের চোখের জল।

একমাত্র গঙ্গা ছাড়া উপরোক্ত সকলেরই দুর্ভাগ্যের কারণ হ'ল মনসা। তাই 'মনসা' নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, হিংস্র, ক্রূর, কুটিল, নিষ্ঠুর, নীচমনা, অমানবিক মেয়ের ছবি। কিন্তু আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে, মনসা চরিত্রের এই নীচতা ও অমানবিকতার জন্যে কতখানি সে নিজে দায়ী? জন্ম মুহূর্ত থেকেই কি তার চরিত্র এরকম, না কি তার আত্মীয় পরিজন এবং পরিবেশ-পরস্থিতিই করে তুলেছে তাকে নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর? মনসার জীবনকে নিছক বাইরে থেকে দেখে বিচার না করে, যদি তার জীবনের একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করা যায়; তাহলে হয়তো বা তার নাগিনী রূপের অন্তরালে এক চিরন্তন নারীকে আমরা খুঁজে পেতে পারি।

মনসার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানারকম মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানবহ্নি বা প্রজ্ঞাবহ্নি থেকে মনসার জন্ম। শিবের মন থেকে জন্ম হয় বলে তার নাম মনসা। অন্যমতে কামোন্মত্ত শিবের ঔরসে তার জন্ম। কামোন্মত্ত শিবের বীর্য পদ্মপাতার উপর পড়ে এবং পদ্মপাতা থেকে তা পড়ে যায়পাতালে বাসুকি নাগের মাথার উপর। সেখানেই তার জন্ম---

মহাদেব পদ্ম তুলে পদ্মবনে বীর্য টলে
তাহা গেল পাতাল স্মঙরি।
পাতালে বাসুকি লৈয়া বিধাতার স্থানে গিয়া
নির্ম্মাইল জয় বিষহরি।।

(কেতকাদাস)

পদ্মবনে জন্ম হওয়ায় মনসার অপর নাম পদ্মা। মনসা দেখতে ছিল অপূর্ব সুন্দরী, বাসুকি নাগ তাকে ভগ্নীস্নেহে গ্রহণ করে। আর এক মতে, কেয়াবনে জন্ম হওয়ায় তার নাম হয় কেতকা। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এগুলির মধ্যে কোন্ মতটি গ্রহণযোগ্য? কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এবং বিজয়গুপ্ত মনসার জন্মবৃত্তান্তকে সামাজিক পরিপেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদেরও বাস্তব পরিপেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। শিবের মন থেকে মনসার জন্ম এ ব্যাখ্যা পুরাণের। মনসা সাপের দেবী। সাপ থাকে ঝোপে-ঝাড়ে। সুতরাং কেয়াবন বা পদ্মবনেই মনসার জন্ম হওয়া স্বাভাবিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেবাদিদেব মহাদেবের সন্তান হ'ল মনসা। কিন্তু দেবতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার দেবলোকে স্থান হয় নি। একটা অবিশ্বাস্য বিকার থেকে তার জন্ম। এর মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। বিনা অপরাধে জন্ম মুহূর্তেই সে পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। এরপর সে পরের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। মাতার স্নেহ সে কোনদিন পায় নি। উপরন্তু তাকে বলা হয় যে, সে যেন পদ্মবনে গিয়ে তার রূপ যৌবন দিয়ে পিতা শিবকে মুগ্ধ করে। তাই বাসুকি তাকে নানা আভরণে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করে পদ্মবনে পাঠিয়ে দেয়---

নানা আভরণে যত ফনিগণে
সাজাল্য তাহার কায়া।

(কেতকাদাস, পৃ.৩৯৪)

কিন্তু এ তার পক্ষে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। এরপর দেখা যায়, জন্মদাতা পিতা তাকে চিনতে পারেন নি। মনসাকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে শিব তাকে প্রণয় সম্ভাষণ করেছেন ---

শিব বলে কেবা তুমি কহ না সত্বরে।
কামে অচেতন হয়ে ধরিলেক করে।।
একি একি বলে দেবী হৈল এক পাশ।
তুমি পিতা আমি কন্যা ভাল জাতিনাশ।
পিতা হয়ে দুহিতারে হরিবে কেমনে।

কলঙ্ক হৈব সভ দেবতা ভুবনে।।

(কেতকাদাস, পৃ. ৩৯৫)

'বাপ হয়ে কন্যাকে প্রণয় সম্ভাষণ'- কি নিদারুণ তার এই লজ্জা! কি দিয়ে ঢাকবে সে এই লজ্জাকে?

পরিচয় দেওয়ার পর শিব তাকে কন্যা বলে স্বীকার করেন এবং তাকে ঘরে নিয়ে যেতে রাজি হন। কিন্তু তাঁর এই স্বীকৃতি প্রকাশ্যে নয়, সকলের সামনে তিনি মনসাকে কন্যা পরিচয়ে ঘরে নিয়ে যান নি। লুকিয়ে ফুলের সাজিতে করে তিনি তাকে গৃহে নিয়ে যান---

ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করে মতি।
পুষ্পের করণ্ডী মধ্যে থুইল পদ্মাবতী।।
হেটে পুষ্প, উপরে পুষ্প দিয়া চারিভিতে।
মধ্যে লুকাইয়া পদ্মা থুইল অলক্ষিতে।।

(বিজয়গুপ্ত, পৃ. ১৫)

কেন এই গোপনীয়তা? কিন্তু এখানেই মনসার বিড়ম্বনার শেষ নয়। চণ্ডী তাকে দেখে সতীন মনে করে বিনাদোষে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে ---

খল খল হাসে দেবী হস্তে দিয়া তালি।
পুষ্পবনে গিয়া কার নারী করল চুরি।।
.....
বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।
মারণের ঘায় পদ্মা করে থরথর।।

(বিজয়গুপ্ত, পৃ. ২৫)

মা (সৎমা) কন্যাকে সতীন সন্দেহ করে। এ তার কতখানি লজ্জা! শুধু তাই নয়, রূপসী যুবতী মনসার চোখ জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে চণ্ডী কানা করে দেয়। নিদারুণ প্রহারের যন্ত্রনায় মনসা ছটফট করতে থাকে ---

পরম সুন্দরী কন্যা অকুমারী বেশ।
চণ্ডীর প্রহারে তার তনু হইল শেষ।।

(বিজয়গুপ্ত, পৃ.২৬)

সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও এই সমস্ত লাঞ্ছনা সে নতমুখে সহ্য করেছে। কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করে নি। বারবার সকাতরে চণ্ডীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ---

বিনা অপরাধে সতাই কেন মার আমা।
প্রণতি করিয়া বলি তবু নাহি ক্ষমা।।

(বিজয়গুপ্ত, পৃ.২৭)

কিন্তু মনসার কোন আবেদনেই চণ্ডী সাড়া দেয় নাই। এ হেন অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে সে বাধ্য হয়েই চণ্ডীকে দংশন করেছে। পরে শিব এসে পত্নীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে মনসা চণ্ডীকে পুনর্জীবন দান করেছে। কিন্তু সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেও শিব কোন প্রতিবাদ করেন নি, দোষী চণ্ডীকে কোন শাস্তি দেন নি।

অতঃপর একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে মনসা চণ্ডীর গৃহেই বাস করতে লাগল। বাধ্য হয়ে মনসাকে ঘরে থাকতে দিলেও ভিতরে ভিতরে তার প্রতি চণ্ডীর আক্রোশ কিন্তু বাড়তেই থাকে। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ইতিমধ্যে মনসার সঙ্গে জরৎকারু মুনির বিয়ে হওয়ায় তার নারী জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ নেমে আসে। দেব সমাজে মনসাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় শিব বৃদ্ধ জরৎকারু মুনির সঙ্গে পূর্ণযৌবনা মনসার বিয়ে দেন। বিগত যৌবন এবং ব্রহ্মচারী মুনি মনসার কাম-বাসনাকে পরিতৃপ্ত তো করলেনই না, উপরন্তু বাসররাত না পোহাতেই তাকে পরিচারিকার মত আদেশ করতে থাকেন ---

রাত্রি শেষ হইয়া আসে নাহি হয় উষা।
গঙ্গাতীর হইতে মোরে আনিয়া দেও কুশা।।

(বিজয়গুপ্ত, পৃ.৪১)

বাসররাতে গঙ্গাতীরে কুশা আনতে যাওয়া একটি মেয়ের পক্ষে যে কতখানি লজ্জাজনক, মুনি তা একবারও ভেবে দেখলেন না। স্বভাবতই মনসা তার এই আদেশ মানতে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু মুনি তখন তাকে বাপ তুলে গালি দিতে থাকলে মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করে এবং জরৎকারু মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। কিন্তু স্বামী যতই অত্যাচারী হোক না কেন কোন স্ত্রী-ই তার স্বামীর মৃত্যু চাইতে পারে না। তাই রাগের মাথায়

একাজ করলেও পরে মনসা তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেয় এবং জরৎকারু তখন মনসাকে মাতা হওয়ার বর দিয়ে তাকে ত্যাগ করে চলে যান। কন্যা হিসেবে তার জীবন পূর্বেই ব্যর্থ হয়েছিল, এখন বধূ এবং মাতা হিসেবেও মনসার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ তার সন্তানের জন্মও স্বাভাবিকভাবে নয়।

সুযোগ-সন্ধানী চণ্ডী এই অজুহাতে মনসাকে ঘর থেকে তাড়াবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেল। শিবকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, এই স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সঙ্গে বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যদি মনসাকে ত্যাগ না করেন তাহলে সে-ই কার্তিক-গণেশকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে ---

অতি কোপে কহে দেবী শিবের গোচর।
কন্যা লয়ে থাক তুমি হয়ে স্বতন্তর।।
.....
নাগজাতি কন্যা তব, মোর কন্যা নাই।
দুই পুত্র লইয়া আমি বাপের বাড়ী যাই।।
মোর সঙ্গে কেমনে থাকিবে পদ্মাবতী।
আপন প্রকৃতি-দোষে ছাড়ি গেল পতি।।

(বিজয়গুপ্ত, পৃ.৪৮)

শুধু তাই নয় ---

অযশ না গণে পদ্মা ধর্মে নাহি অঙ্ক।
জরৎকারু মুনি মারিয়া রাখিল কলঙ্ক।।

(বিজয়গুপ্ত, পৃ.৪৯)

সব শুনে শিব চণ্ডীর দাবি মেনে নিলেন, কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। কারণ চণ্ডী মুখরা। তাই শাস্তি দিলেন নির্দোষ অবলা হতভাগা কন্যাকে---

মনসারে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর।
"বনবাসে দিব তোমা, চলহ সত্বর।।"

(বিজয়গুপ্ত, পৃ.৫০)

বাপের গৃহে তার স্থান হ'ল না। শিব তাকে বিসর্জন দিয়ে এলেন গৃহ থেকে বহু যোজন দূরে জঙ্গালের মধ্যে নির্জন সিঁজুয়া পর্বতে। এমন কি তার আত্মরক্ষার পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করলেন না। একবারও ভেবে দেখলেন না সুন্দরী যুবতী কন্যা একাকী ঐ নির্জন পর্বতে কি করে থাকবে। তার খাওয়া পরারও কোন ব্যবস্থা তিনি করলেন না। এমন কি বিনাদোষে লাঞ্ছিতা নতমুখী মনসা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন চণ্ডী তাকে চরম অপমান করে একখানা একহাত লম্বা গামছা দেয় পরিধান করার জন্যে। তাতেও পিতা নীরব দর্শক হয়ে থাকেন। অগত্যা অসহায় মনসা সিঁজুয়া পর্বতে একাই থাকতে রাজি হ'ল। সে ভাবল অন্তত স্বাধীনতাটুকু তার থাকল এখানে। কিন্তু তাও তার ভাগ্যে সইল না। চণ্ডীর ভয়ে সূর্যাস্তের পূর্বেই শিবকে ঘরে ফিরতে হবে। তাই তিনি দ্রুত পথ হাঁটতে শুরু করলেন। ফলে তাঁর দেহ থেকে ঘাম নির্গত হ'ল এবং সেই ঘাম থেকে জন্ম হ'ল নেতর। জন্মের পর 'পিতা পিতা' করে সে শিবের পিছনে ছুটতে লাগল। শিব তখন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে তার জন্মবৃত্তান্ত বলল। তখন শিব ভাবলেন, এক মেয়েকে এই সিঁজুয়া পর্বতে রেখে এলেন, এখন আর এক মেয়ের দৌরাত্ম্য! মেয়েদের ঝামেলা থেকে কি তাঁর বাঁচার কোন উপায় নেই। অতঃপর নেতকে তিনি আবার সিঁজুয়া পর্বতে মনসার কাছে নিয়ে গেলেন। মনসাকে বললেন, " এ তোমার সহচরী রূপে তোমার কাছে থাকবে। এর কথা তুমি মেনে চলবে।" অর্থাৎ যে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাটুকু সে পাবে ভেবেছিল তাও এখন হরণ করা হ'ল।

আমাদের মনে কি এখন এই প্রশ্ন জাগে না যে, সুকুমার বৃত্তি অনুশীলন করার কোন সুযোগই যার জীবনে ঘটে নাই, সমগ্র জীবনব্যাপী যে বিড়ম্বিত, নরকের মধ্যে যার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা; কী করে হবে সে নমনীয়, স্নেহশীল? নিজের বাসরঘর যার ভেঙে গেছে, সে কি করে দেবে অন্যের বাসরঘর সাজিয়ে? যার ভাণ্ডারে শুধু বিষই রয়েছে সে তো বিষই উদ্গীরণ করবে। চিরকাল নিজে সে নির্যাতীত হয়েছে বলেই অপরকে নির্যাতন করেছে। সমগ্র জীবন ধরে আক্রান্ত হতে হতে সে হয়ে উঠেছে ভীষণ, ভয়ঙ্কর। কাজেই এখন যদি সে আগ বাড়িয়ে কাউকে আক্রমণ করে বা তার উপর আজীবনব্যাপী অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে

চায় তবে তা তার চরিত্রের উপযোগীই হবে। তাই দেখা যায়, সমুদ্র মন্থনের বিষপানে মৃত শিবকে বাঁচানোর জন্যে গণেশ যখন তাকে নিতে আসে তখন মনসা তাকে বলে যে পিতা তাকে কন্যা বলে কোন মর্যাদা দেয় নি, তাকে গৃহে স্থান দেয় নি, পিতার কোন কর্তব্য করে নি, এমন কি পিতা হয়ে যে কন্যাকে প্রেম নিবেদন করে সেই পিতার মৃত্যুই তার কাছে শ্রেয়। তাঁকে বাঁচানোর কোন প্রয়োজন তার নেই। সবচেয়ে বড় কথা যে সৎমা চণ্ডী তার জীবনের এই পরিণতির জন্যে দায়ী, শিবের মৃত্যুতে সেই চণ্ডী আজ বিধবা হতে চলেছে ভেবে তার অভিমানী মন বলে উঠেছে ---

বিষপানে মরিল মহেশ মোর বাপ।
চণ্ডিকা রণ্ডিকা হৈল ঘুচিল সন্তাপ।।

(কেতকাদাস, পৃ.৩৫)

বাবার মৃত্যুতে মনসার এই আচরণ যদিও খুবই স্বাভাবিক, তথাপি বাবা যত অন্যায়ই করুক না কেন কোন মেয়েই কখনো বাবার মৃত্যু কামনা করতে পারে না। তাই অভিমান করে মুখে যাই বলুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মনসা শিবকে ঠিকই বাঁচিয়ে দিয়েছে। শুধু মনসা কেন, মনসার জায়গায় অন্য যে কোন মেয়ে হলেও কি, বা শুধু মেয়ে কেন, যে কোন ছেলে হলেও কি এ হেন পরিস্থিতিতে ঐ একই রকম উক্তি করত না?

বিনাদোষে মনসার নিজের বাসরঘর ভেঙে গেছে। তাই সে নির্দোষ বেহুলার বাসরঘর ভেঙে দিয়েছে। অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে সে চাঁদসদাগরের পূজা পায় নি। তাই সে চাঁদ সদাগরের উপর অত্যাচার করে তাকে বাধ্য করেছে তার পূজা করতে। একটি অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর রমণীতে পরিণত হয়েছে সে। মনসার এই ভীষণ, ভয়ঙ্কর স্বভাবের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে তাকে শুধু দায়ী করা যায় না। কারণ জন্মসূত্রে সে ভীষণ নয়, নিজের আত্মীয়রাই তাকে করে তুলেছে ভীষণ। যে তার কেউ নয় সেই বাসুকির কাছ থেকে যে ভগ্নীস্নেহটুকু সে পেয়েছে, নিজের পিতার কাছ থেকে সে তা পায় নি। বিনাযুদ্ধে কেউ তাকে এক ইঞ্চি জায়গাও ছেড়ে দেয় নি। ফলে যুদ্ধ করতে করতে তার স্বভাব হয়ে উঠেছে আক্রমণাত্মক। তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার জীবনের পরিস্থিতি, তার আত্মীয়-স্বজনই তাকে নারী থেকে নাগিনী করে তুলেছে। জীবন যদি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করত তাহলে সে আর পাঁচটা মেয়ের মতই স্নেহময়ী নারী হতে পারত, বিষময়ী নাগিনীতে পরিণত হত না। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনসাকে ব্যক্তিগতভাবে তার ভয়ঙ্কর স্বভাবের জন্যে দায়ী করা গেলেও প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এজন্যে সে দায়ী নয়, দায়ী তার বিড়ম্বিত জীবন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :-

১. বাইশ কবির মনসা-মঙ্গাল বা বাইশা - ড. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সঙ্কলিত, (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ ।

২. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসা-মঙ্গাল, প্রথম খণ্ড, — শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ ।

৩. বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গাল — প্যারীমোহন দাশগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও সুরেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৩৭ ।

৪. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র — ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা — ৯, ১৯৯১ ।